ছাড়পত্র

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সকালে মৃদুলা এসে হাজির।

শোন, ভীষণ মুশকিলে পড়েছি। কাল আমার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। অথচ সামনের সপ্তাহেই আমার ফ্লাইট। ছুটিও নেই।

চোখ কপালে তুলে বলি, সর্বনাশ! পাসপোর্ট হারানো তো খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার!

তাই তো তোমার কাছে আসা। এখানে আমার পুরুষ সাহায্যকারী কেউ নেই। তুমি ছাড়া।

আমি মৃদুলার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা ভাবি। আমি ওর সাহায্য- কারী, এ কথা ভাবতে আমার একটু কষ্ট হল। মৃদুলার সঙ্গে প্রায় বছর আটেক আগে আমার বিয়ে হয়। অসম বিয়ে। আমি ছিলাম সামান্য সরকারী অফিসার। মৃদুলা তখন সায়েন্স কলেজের দুর্দান্ত ছাত্রী। ফিজিক্সে এম. এস. সি. করেছে রেকর্ড ভাঙা নম্বর পেয়ে। রিসার্চ করছিল। এমন সময় কানাডা থেকে স্কলারশীপ পেল। বিদেশে যাওয়ার আগেই ওর সেকেলে বাপ - মা জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়। আর সেই বলির পাঁঠাটি ছিলাম আমি। বিয়ের ছ'মাসের মাথায় মৃদুলা বাইরে চলে গেল, আমি পড়ে রইলাম, স্বভাবতই আমাকে মৃদুলার পছন্দ হয়নি। না হওয়ারই কথা। আমাদের মধ্যে চিঠি চালাচালি কিছু দিন বজায় রইল। তারপ সেই যোগ খুবই গৌণ হয়ে গেল। এ সবই হয়েছিল অতি স্বাভাবিক নিয়মে। যেন এ রকম হবে বলেই আমারও একটা আঁচ করা ছিল। বিয়ের সময় এবং পরবর্তী ছ'মাসে মৃদুলার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র ঘনিষ্ঠতা হয়নি, শরীরের সম্পর্ক ও নয়! ওর ঐ দুর্দান্ত ক্যারিয়ারের জন্যই আমি ওর কাছে ঘেঁষতে সাহস পেতাম না। আমি বড়ই কাপুরুষ।

কানাডা থেকে বছর তিনেক বাদে একদিন ফিরে এলো মৃদুলা এবং আমাকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ দিল। তার আগে অবশ্য আমার কাছে এসে স্নেহভরে আমাকে বোঝাল, এই বিয়েটা জিইয়ে রাখার কোন মানেই হয় না। কারণ, আমরা কেউ কাউকে কোন দিনই পাব না। আমাদের মধ্যে ভালোবাসা বা সম্পর্কের গভীরতাও নেই। সুতরাং আমি যেন মিউচুয়েল সেপারেশনে রাজি হই। বলতেনেই একটু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু মৃদুলোকে আটক করার কোন মানেও তো হয় না। আমি তাই ওর মতে মত দিলাম। আদালত আমাদের বিচ্ছেদ মঞ্জুর করে দিল।

শুনেছি মৃদুলা কানাডায় এক সাহেব অধ্যাপককে বিয়ে করেছে। দুজনেই অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত। ভালোই হয়েছে। দুই পড়ুয়ার মিল ঘটেছে। আমার নিজের কপাল অতটা ভালো নয়। মৃদুলা আমাকেপছন্দ না করায় আমি কাপুরুষ হয়ে যাই এবং দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সাহসটুকুও আমার লোপ পায়। বাড়ির লোকেরা এই নিয়ে ঝামেলা করায় আমি বাড়ি ছেড়ে আলাদা একটা ঘর নিয়ে বসবাসকরি। এক রকম কেটে যায়। মৃদুলার সঙ্গে অবশ্য বরাবরই আমার চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। আমি একটা চিঠি দিই মাসে বা দু'মাসেঅন্তরও ওরও ঐ রকম দেরীতে জবাব আসে। আমরা তো পরস্পরকে ঘৃণা করিনি, শুধু ভালোবাসতে পারিনি মাত্র। সেইজন্য আমাদের উভয়ের উভয়ের প্রতি একটা সমবেদনাও ছিল। চিঠি দিয়ে অপরাধবোধ আমরা স্খালন করার চেষ্টা করতাম।

এবারও মৃদুলা এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে! একটা বিদেশী ছাতা, একটা সোয়েটার আর হাতঘড়ি দিয়েছে। আমি ওকেশিল্কের শাড়ি আর পোড়ামাটির পুতুল কিনে দিয়েছি।

পাসপোর্ট হারানোর খবরে আমি বিচলিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলি, কী করতে হবে বল। যা সাহায্য চাও সবই করব।

ও চিন্তিত ভাবে বলল, এ দেশের থানা পুলিশ খুব কো - অপারেটিভ নয়। তুমি তো সরকারী কাজ কর, তোমার ইনফুয়েন্সে খানিকটা কাজ হতেপারে।

আমি তাড়াতাড়িপ্যাসেজে দাঁড়িয়ে পোশাকপাল্টে নিতে নিতে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি করে হারালে?

ঘর থেকে মৃদুলা জবাব দেয়, বুঝতে পারছি না। কাল অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে। ট্রানজিশনে ট্যাক্সি বা মিনিবাস বা রাস্তায় পড়ে গেছে বোধ হয়। এদেশের লোকও ভীষণ ইররেসপন্সিল। পাসপোর্ট যে ফেরৎ দিতে হয় তাই হয়তো জানে না।

কথাটা সত্যি। পাসপোট হয়তো অনেকে চেনেও না, পেলে সেটা নিয়ে কী করতে হবে তা মাথায় ঢোকার কথাও নয়। আমিবললাম, খুবই মুশকিল!

মৃদুলাদের বাড়ি টালিগঞ্জে। ডিভোর্সের পর ওর মা বাবা ওকে বাড়িতে প্রথম প্রথম ঠাঁই দিত না। এখন দেয়। মানুষ তো সব কিছুই সহ্য করতেপারে। এই সামান্য ব্যাপারটাই বা পারবে না কেন!

আমরা ট্যাক্সি নিয়ে টালিগঞ্জ থানায় হানা দিলাম।

একজন সাব ইন্সপেক্টর মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনে বললেন, কিন্তু আমাদের এরিয়ায় যদি না হারিয়ে থাকে তবে আমরা ডায়েরী নিই কি করে?

আমি বিপন্ন মুখে বললাম, তহলে?

উনি বললেন, তহলে লালবাজারে চলে যান। ওরা বলতেপারবে।

গেলাম লালবাজারে। এখানেও একজন গোমড়ামুখো লোক সব শুনে বললেন, আগে কোন থানায় ডায়েরী করিয়ে আসুন। আমরা! ডাইরেক্টলি নিতেপারি না।

কোন্ থানায়?

যে থানার এরিয়ায় হারিয়েছে।

কিন্তু সেটা তো বলা যাচ্ছে না।

মনে করার চেষ্টা করুন।

আবার বেরোলাম। ট্যাক্সিতে বসে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোন কিছু মনে পড়ছে না?

মৃদুলা ভ্রু কুঁচকে বলে, মনে পড়লে তো হয়েই যেত। যদি ট্যাক্সি বা মিনিবাসে হারিয়ে থাকে তবে কোন্ এরিয়ায় হারিয়েছে তা বলব কি করে?

আমি বললাম, তহলে চল, একটার পর একটা থানায় হানা দিই।

একটু বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে মৃদুলা বলে, তোমার কোন ইনফ্লুয়েন্স নেই। কোন মিনিস্টার বা কারো সঙ্গে চেনা জানা?

আমি যে কত বড় অপদার্থ তা মৃদুলা জানে না। অফিস থেকে ঘর আর ঘর থেকে অফিস ছাড়া আজকাল আমার আর কোন পরিধিই নেই। সে কথা চেপে গিয়ে বললাম, নেই যে তা নয়, তবে এখুনি ঠিক মনে পড়ছে না।

মৃদুলা চুপ করে রইল।

আমরা মুচিপাড়া, করেয়া, হেয়ার স্ট্রিট একের পর এক ফাঁড়িতে হানা দিই। কেউ বলল খোঁজ পেলে জানাবে। কেউ অন্য থানায় যেতেপরামর্শ দিল। কেউ বলল, পাসপোর্ট। ও বাবা, ও হারালে জেল। ডায়েরী নিতে কেউ সাহস পেল না।

বেলা যথেষ্ট গড়িয়ে গেছে। মৃদুলা বলল, ভীষণ খিদে পেয়েছে। চল, কোথাও কিছু খেয়ে নিই।

আমরা পার্ক স্ট্রীটের কেতাদুরস্থ এক রেস্টুরেন্টে ঢুকে খেতে বসি।

মৃদুলা মৃদুস্বয়ে বলল, তুমি কিন্তু হাঁপাচ্ছ।

আমি লজ্জিত হয়ে বলি, আসলে টেনসনটা খুব বেশী তো।

মৃদুলা একটু হেসে বলে, ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই হবে। হয়তো সামনের সপ্তাহে যাওয়া হবে না।

তোমার স্বামী চিন্তা করবেন।

তা করবে। তবে ট্রাঙ্ক-কলে ওকে ঘটনাটা জানিয়ে দেব।

আমি উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করি, পাসপোর্ট হারালে কি জেল হয়?

মৃদুলা মাথা নেড়ে বলে, বিদেশে হারালে হয়। এখানে হয়তো তা হবে না। তবে নানারকম কমপ্লেক্সিটি দেখা দেবে। থাকগে, অত ভেবো না তো, তোমাকে এমনিতেই ভীষণ উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তুমি কি শুয়োরের মাংস খাও?

আমি অবাক হয়ে বলি কেন?

তাহলে হট ডগ খেতে পারো।

কখনো খাইনি, তবে খেতে আপত্তিও নেই।

তাহলে বলে দিই।

ও বেয়ারাকে তিন চার রকমের খাবারের কথা বলে দিল। তারপর একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, উঃ, আমিও বোধ হয় হাঁফাচ্ছি।

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ।

খেতে খেতে হঠাৎ আমার কানুর কথা মনে পড়ে গেল। ইমপর্ট্যান্ট পোস্টে কত না ঘনিষ্ঠ লোক বসে থাকে। কিন্তু সময় কালে মনে পড়ে না। মনে পড়তেই লাফিয়ে উঠে বললাম, আরে! কানুর কাছে গেলেই তো হয়। ও তো হোম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি!

সে কে?

আমার জ্যেঠতুতো ভাই। কানু আমাদের বাসর ঘরে যে তোমাকে আফ্রিকান জুলু নাচ দেখিয়েছিল বলে তুমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলে। মনে নেই? সেই তো কানু?

মৃদুলা বিরক্তির সঙ্গে বলে, আচ্ছা না হয় হল। আগে খেয়ে তো নেবে।

আমি সে কথায় কান না দিয়ে দৌড়ে গিয়ে কাউন্টার থেকে রাইটার্সে টেলিফোন করি এবং ভাগ্যক্রমে কানুকে পেয়েও যাই।

কানু! আরে শোন, মৃদুলার পাসপোর্ট হারিয়েছে, ভীষণ বিপদ।

কানু হুংকার দিল, মৃদুলাটা কে?

আরে -- ঐযে -- মৃদুলা যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল!

বিদুষী ভার্যা! হাঃ হাঃ তা তার সঙ্গে তোমার এখন কিসের সম্পর্ক?

উই আর ফ্রেন্ডস। শোন না, ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। ও এখানে আটকা পড়ে যাচ্ছে, ওদিকে প্লেনের টিকিট কাটা রয়েছে।

কিছু বুঝতে পারছি না, আরও স্পেসিফিক ভাবে বল।

বললাম, কানু শুনল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর উদাস গলায় বলল, দেখি কী করা যায়।

করা যায় নয়, করতেই হবে। পুলিস চেষ্টা করলে সব পারে।

চেষ্টা করব, পরশু খোঁজ নিও।

আমি ফিরে এসে তৃপ্ত উজ্জ্বল মুখে মৃদুলাকে বললাম, মনে হচ্ছে পেয়ে যাবে। কানুর ইনফ্লুয়েন্স সাংঘাতিক।

মৃদুলা এতক্ষণ চামচ তুলে বসে ছিল। আমি ফিরে আসার পর আবার একসঙ্গে খাওয়া শুরু করলাম। ভারী ভালো লাগছিল আমার। নিশ্চয়ই মৃদুলার পাসপোর্ট পাওয়া যাবে।

পাওয়া গেলও পরশু নয়, পরদিনই লালবাজার থেকে একটা জীপ ভোরবেলা গিয়ে মৃদুলার বাড়িতে পাসপোর্ট পৌঁছে দিল। মৃদুলা অফিসে আমাকে টেলিফোন করে বলল, তোমার ভাই আমার পাসপোর্ট উদ্ধার করেছেন। তোমার ভাইকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দিও।

আমি উদার গলায় বললাম, আরে ধন্যবাদ - টন্যবাদের আবার কি আছে। কানু তো আমার ভাই। পেয়েছ এটাই আমাদের আনন্দ।

মৃদুলা এ কথার কোন জবাব দিল না। ফোন ধরে চুপ করে আছে, টের পেলাম। অনেকক্ষণ বাদে বলল, পাসপোর্টটা না পেলে আমার খুব মুশকিল হত। সে তো ঠিকই। আমি সামনের সপ্তাহে চলে যাচ্ছি।

তাহলে?

সেটা তো আগেই বলেছ।

বলেছি, ও হ্যাঁ, তাই তো।

কালকেই বলেছিলে। তোমার স্বামীকে ট্রাঙ্ক-কল করেছ?

না তো! করার দরকার হয়নি। আজই হয়তো করতাম। কিন্তু পাসপোর্টটা পেয়ে গেলাম যে।

যেন খুব বিপদে পড়েছে এমন শোনাল মৃদুলার গলা!

বললাম, ঠিকই তো, পাসপোর্টটা নিয়ে আর বেরিও না। খুব সাবধানে রেখো।

হ্যাঁ, খুব সাবধানে রাখব। আবার হারালে লোকে সন্দেহ করবে, বোধ হয় ইচ্ছে করেই হারাচ্ছি।

কেন? সন্দেহ করবে কেন?

আমার নিজেরই যে এরকম সন্দেহ হয়। বলেই মৃদুলা ফোন রেখে দিল। কথাটার মানে ঠিক বুঝলাম না। তবে মনে হল, এর চেয়ে ভালো কথা জীবনে শুনিনি।

তিন দশকের সেরা গল্প